Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনা : অভিজাত ও ব্রাত্যের দ্বৈরথ

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	চঞ্চলকুমার বোস
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).8
Pages	১৪১-১৬৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ৩ ॥ আষাঢ় ১৪১৯ ॥ জুন ২০১২

রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনা : অভিজাত ও ব্রাত্যের দ্বৈরথ

Check for updates

চঞ্চলকুমার বোস*

মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং মনুষ্যত্বে আস্থার উপলব্ধি সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। দুই শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় পরিস্রুত রবীন্দ্রনাথ সংকটে-সংগ্রামে নৈরাশ্যে-জাগরণে মানুষের প্রতি রেখেছেন শেষ নির্ভরতা। রবীন্দ্রসাহিত্যে মানুষের সামগ্রিক রূপ অখণ্ড মহিমায় উদ্ভাসিত। জীবনের প্রথম পর্যায় থেকে সুগভীর প্রত্যয় নিয়ে মানুষের যে মহিমান্বিত সত্তার প্রতি নিষ্ঠা রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ধ্বংস-বিপর্যয়ের অভিঘাতে সে-বিশ্বাস কম্পিত হলেও শেষাবধি কবি মনুষ্যত্বের প্রতি অবিচল থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রতিক পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ বাস্তবতায় মানুষের পৈশাচিক বর্বরতা এবং মানবসভ্যতার উগ্র আক্রোশে মর্মাহত হলেও মানুষই তাঁর সমগ্র জীবনবোধের কেন্দ্রীয় বিষয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে মানুষ সম্পর্কে কবির এত ব্যাপক বিশ্লেষণী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে যে, তাঁর সাহিত্যে কোনো বিশেষ দুর্লভ মুহূর্তেও মনে হয় না তিনি মানুষকে কখনো গৌণভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন বা মানুষের মধ্যে হতাশ হবার মতো কোনো নেতিবাচকতা বা হতাশার বীজ খুঁজে পেয়েছেন। মানুষ-সম্পর্কিত রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে কবির নির্মোহ আত্মমূল্যায়ন। মানুষের সত্যিকার স্বরূপ কী, কী করলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটতে পারে, সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ব্যক্তি বা সমষ্টিগত মানুষের কী অবদান থাকা প্রয়োজন, ব্যক্তি-মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে কী করে বিশ্বমানবের ধারণা গড়ে ওঠে — এ সবই রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণসূত্রেই উপলব্ধি করা যাবে, মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে যে তীব্র বিভাজন, অভিজাত ও ব্রাত্যমানুষের বিপ্রতীপ দ্বন্দ্বে সভ্যতার চলমান প্রবাহ যে নানাভাবে বিক্ষুব্ধ, বিশ্বমানবিকতার ঐকান্তিক অনুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ সে-সত্যকে এড়িয়ে যাননি। কিন্তু নানা গোত্রে বিভাজিত মানুষের বৈচিত্র্যময় স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়েই বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মানবসম্পর্কিত ধারণাটি শক্ত স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং আমরা উপনীত হই এই সিদ্ধান্তে যে, ত্যাগে-প্রেমে-কল্যাণে-ঔদার্যে এবং মানবীয় অনুভূতির ঐক্যে যে বিশ্বমানবমূর্তি গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু সন্ধান করেছেন সেই বিশ্বায়ত মানবকে। উপনিষদের নিগূঢ় অনুভূতিতে স্নাত হয়েই রবীন্দ্র-মানসকাঠামোর নির্মাণ। কল্যাণময় ঔপনিষদিক চেতনার বৃহত্তর আলোকে তিনি অবলোকন করেছেন মানুষকে। রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশের সন্তান এবং একই সঙ্গে তিনি রেনেসাঁসের উত্তরাধিকারে ঋদ্ধ। উনিশ শতকের ঠাকুর পরিবারে অভিজাত ব্রাহ্ম রুচির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভিক্টোরীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ঔপনিবেশিক কোলকাতার আধুনিকতাকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ পরিস্রুত হয়েছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতা ও অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে। রবীন্দ্র চৈতন্যের ক্রমবিকাশে

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

রেনেসাঁসের উদার মানবচেতনার প্রবর্তনা গুরুত্বপূর্ণ। উপনিষদের গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির পাশাপাশি রেনেসাঁসের উদার সর্বশৃঙ্খলমুক্ত জীবনদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মানবধারণাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিকর্মে মানবধারণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কল্যাণময়তা, সত্যানুভূতি, অধ্যাত্মময়তা, সর্বজনীনতা এবং বিশ্বমানবিকতার চিরায়ত বোধ।

রবীন্দ্রনাথের মানবসম্পৃক্ত ধারণা নির্মাণে তাঁর ঐতিহ্যিক পটভূমিকার কথা বিস্মৃত হবার নয়। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মোদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পিতা দেবেন্দ্রনাথের সাংগঠনিক তৎপরতা এবং বহুমুখী উদ্যম। ভারতীয় দর্শন এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁ-উত্তর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত দেবেন্দ্রনাথ আত্মিক ও চিত্তসংকট মুক্তির চেষ্টায় আশ্রয় নেন রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে। দেবেন্দ্রনাথের এই ঈশ্বরপ্রীতির মূল কারণ সামন্ত মূল্যচেতনায় সমর্পণ নয়, বরং ইউরোপীয় রেনেসাঁর গভীরে শেকড় সঞ্চার করেই তিনি এই মননচর্চায় বৃত হন। তাঁর এই মননচর্চা বস্তুত নবজাগরণের আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনেরই নামান্তর। গৌতম বুদ্ধ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের চণ্ডীদাস কিংবা ভারতের নানা ত্যাগধর্মী তত্ত্ব-দর্শনের ধারাবাহিকতা, রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে মানুষের মহৎ রূপ প্রত্যক্ষ করা, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস বাণীর শুশ্রূষার আলোকে ভারতের ভূমিতে গড়ে উঠেছে মানবতার এক উদার পরিবেশ ও আবহ। স্মরণ রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজাগতিকতা, মানবতাবাদ, সর্বভারতীয় ঐতিহ্যচেতনা, কর্মযোগের সঙ্গে ধর্মবোধ, বিজ্ঞানবোধের সঙ্গে তাঁর চলিষ্ণুতার অনুভূতি, গভীর নিরাসক্তি — এ সবকিছুই নিহিত ছিল তাঁর ঐতিহ্যের গভীরে। রবীন্দ্র-সমালোচকের দৃষ্টিতে :

> প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সচল অর্থ-চেতনা, ফলিতবিদ্যা ও বিজ্ঞানমনস্কতার বাস্তব উৎস থেকে দেবেন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের জন্ম। এবং তা স্বতন্ত্র, সতেজ ও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল নবজাগরণের অনুকূল ভাবাদর্শের আবহাওয়ায়। কার্যত, নবজাগরণের মানবতাবাদ, আত্মচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য; দ্বারকানাথ ঠাকুরের কর্মযোগ, সৃষ্টিক্ষমতা, সতর্ক উদ্যম, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞান, এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিরাসক্তি, ঐতিহ্যবোধ ও পরিশীলিত অন্তর্বিষয়কশক্তি শোণিতপ্রবাহে ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। (আকরম, ১৩৮৮ : ৭)

রবীন্দ্র-চেতনায় এবং সৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের অন্য নাম ধর্ম এবং মানুষের পরিপূর্ণতার বোধ থেকেই একজন মানুষ হয়ে ওঠে আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন। বিশ্বজনীনতার অনভূতি এবং জীবন সম্পর্কে সমগ্রতাবোধের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে এই পরিপূর্ণতার ধারণা। জোড়াসাঁকোর পারিবারিক পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ পরিচর্চিত হয়েছেন যে আবহে, সেখানে ছিল পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চর্চা এবং অন্যদিকে ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ-মোগল-ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচর্যা। এই সংস্কৃতির আদলে পল্লবিত রবীন্দ্রনাথ মানবতার প্রশ্নে ধারণ করেছেন এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার :

> রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনসাধক, মানবপ্রেমিক সাহিত্যরূপস্রষ্টা। এ প্রশ্নে তিনি রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের উত্তরসূরী মানবতাবাদী। (আকরম, ১৩৮৮ : ৩২)

সাহিত্য কিংবা কাব্যচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত পালাবদল যে-কোনো রবীন্দ্রপাঠকমাত্রই বিদিত। উনিশ এবং বিশ শতকের জাতীয় এবং বিশ্ব-অভিজ্ঞানে পরিস্রুত রবীন্দ্রনাথ কাব্যের বিষয়ে এবং রূপে রূপান্তরিত হয়েছেন ক্রমাগত। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও তাঁর মৌল আগ্রহ ছিল মানুষে এবং মানবিকতায়। ১৩০০ সালে প্রকাশিত *সোনার তরী* কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মানবিকতার যে রূপ অন্বেষণ করেন তাতে দেবত্বের স্পর্শ থাকলেও মানুষই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে। 'পরশপাথর' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দুর্লভের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে একসময় অর্ধেক জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন ভ্রান্তির ঘোরে এবং অধরা সেই পরশপাথরের জন্য বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণও বিসর্জন দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। অথচ 'বৈষ্ণবকবিতা'-য় এসে দেবত্বের আবরণ ছিন্ন করে তিনি মনুষ্যত্বের আলোয় উদ্ভাসিত। বৈষ্ণবকবিতার অধ্যাত্মরসের সঙ্গে তিনি সমীকৃত করলেন মর্ত্যমানবের পার্থিব রস। কিন্তু দেবত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে *চিত্রা* কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রবলভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। ১৩০২ সালে প্রকাশিত *চিত্রা* কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'সংসারের তীরে' ফিরে আসার যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তার মৌল আশ্রয় হলো মানবানুভূতি। কল্পনার তরঙ্গে আন্দোলিত না হয়ে তিনি মানবের মুখোমুখি হবার তীব্র আকুতি ঘোষণা করেছেন। এই মানবঘনিষ্ঠতার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের মানবকেন্দ্রিক প্রত্যয়েরই প্রতিবিম্ব। যে-মানুষের পাশে তিনি যেতে চান তাদের তিনি আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে জড়িয়ে নিতে চান অকপটে :

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা — এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা —
(রবীন্দ্রনাথ (২), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ১৪২)[১]

আভিজাত্য আর কৌলীন্যের দূরাগত সম্পর্ক ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ-ব্যাধি-দারিদ্র্যজীর্ণ মানুষের বেদনায় আপ্লুত হলেন। এই মানবসম্পৃক্তির আকাঙ্ক্ষা কেবল ক্ষণিকের মোহ নয়, আজন্মলালিত মনুষ্যত্বধারণার যে জ্যোতির্ময় রূপ আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনায় শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করি, এই উক্তি সেই মানবপ্রত্যয়েরই অকুণ্ঠ উচ্চারণ :

কবি, তবে উঠে এসো — যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা — সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
(রবীন্দ্রনাথ (২), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ১৪২)

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে মনুষ্যত্বের সম্পর্ক নিগূঢ় হলেও ধর্ম-দৈবচেতনা-আস্তিক্যবুদ্ধি কখনো তার মানবধারণাকে গ্রাস করেনি। ১২৯৭ সালে প্রকাশিত *বিসর্জন* নাটকে শাস্ত্রীয় প্রথা ও আচারের সঙ্গে মানবিকতার তীব্র দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ নিরঙ্কুশভাবে পক্ষ নিয়েছেন মানুষের। শতাব্দীপ্রাচীন জীর্ণ ধর্মীয় প্রথাকে বাতিল করে, বলিপ্রথাকে নিষিদ্ধ করে

রাজা গোবিন্দমাণিক্য যে বিধান জারি করেন, তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শাস্ত্র ও মানবতার দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ মানবতার চিরন্তন বাণীকেই তুলে ধরেছেন। মানবতার পক্ষে এই অবস্থান ভারতীয় জীবন-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। রঘুপতি ও রানী গুণবতীর দেবভক্তি ও শাস্ত্রীয় আনুগত্যের বিপরীতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য ধর্মের নামে বীভৎস রক্তপাত দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন :

> বৎসে, আমি বাক্যহীন — এত ব্যথা কেন,
> এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?
> (রবীন্দ্রনাথ (১), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৫৩৯)

দেবতার নামে জীবরক্তপাত নিষিদ্ধ করলে সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত জয়সিংহ জীবনের হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হয়ে আত্মঘাতী হয়। কিন্তু গোমতীর জলে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে হিংস্র বলিপ্রথার অবসানে গোবিন্দমাণিক্য শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকেন। রঘুপতি তার আজন্মের সংস্কার ভেদ করে সমস্ত মোহ ও ভ্রান্তি দূর করে নাটকের অন্তিক পর্বে বলেছে :

> পাষাণ ভাঙিয়া গেল — জননী আমার
> এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
> জননী অমৃতময়ী।
> (রবীন্দ্রনাথ (১), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৫৩৯)

রক্তপিপাসু পাষাণ রাক্ষসীর জায়গায় জননীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবিকতার আবাহনকেই স্বাগত জানিয়েছেন। দেবতার স্থানে মানুষের প্রতিষ্ঠাই তাঁর শেষ অন্বিষ্ট।

১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষ ও মানব-অস্তিত্বের বৃহত্তর অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। রাশিয়া ভ্রমণকে 'তীর্থভ্রমণের' সঙ্গে তুলনা করাটা আবেগপ্রসূত হলেও হতে পারে, কিন্তু রাশিয়ায় শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যপরিবর্তনের জন্য যে বিপুল আয়োজন সেখানে চলছিল, তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে আশাবাদী হয়েছেন। এ সূত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, ১৮৯৮ সালের শেষ দিকে জমিদারি দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববাংলার শিলাইদহে আসেন। জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি এখানে কবি সাধারণ পল্লিবাংলার দরিদ্র প্রজাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কৃষি-শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। পতিসর কৃষি ব্যাঙ্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমুদয় অর্থ জমা দিয়েছিলেন দরিদ্র চাষিদের ঋণ সাহায্য দেওয়ার জন্য। রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলার নিপীড়িত চাষিদের কথা একমুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। *রাশিয়ার চিঠিতে* (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের এই মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে :

> কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা — ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়। (রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৫৬২)

নিপীড়িত মানুষের উপর কায়েমি-স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম যে রাজন্যের পক্ষে থাকে, কবি তা জানতেন। সে জন্য ধর্মকে তিনি বলেছেন 'বিষকন্যা'। মানুষ ও মনুষ্যত্বে আস্থাবান রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার হওয়া সত্ত্বেও রাজা ও ধর্মের সম্পর্কের স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন বিপ্লবী-মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে :

> এ-পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো ; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার। সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে — অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। (রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৫৭৭-৫৭৮)

পতিসর এলাকায় ছয়শ গ্রাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠনের সূচনা কিংবা শ্রীনিকেতনে (১৯২২) তাঁর ব্যাপক পল্লি-উদ্যোগ কর্মী ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের মানবঘনিষ্ঠতার স্পৃহাকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ জয় করতে চেয়েছিলেন একটি বা দুটি ছোট গ্রাম। তিনি বিশ্বাস করতেন, যদি অন্তত দুটি বা তিনটি গ্রামকেও কোনোভাবে মুক্তি দেওয়া যায় অজ্ঞতা বা অক্ষমতার বন্ধন থেকে তবে তৈরি হবে সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ। পতিসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মণ্ডলিপ্রথা, সমবায় নীতি, সম্ভাব্য যন্ত্রশক্তি এবং পল্লিকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল সূত্রগুলো বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করেছিলেন। কালিগ্রাম পরগণায় গড়ে ওঠা কৃষি সমবায়, তাঁত সমবায়, আখ সমবায়, বয়ন স্কুল, পতিসর কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ট্রাকটরের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি প্রাগ্রসর উদ্যোগের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করা যায় কর্মী রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি, মানবহিতৈষণা এবং মৃত্তিকালগ্নতার কথা। দেশ বলতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে বুঝতেন। পতিসরে এবং শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যা করতে চেয়েছিলেন তারই প্রতিফলন তিনি লক্ষ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় এবং বলেছিলেন — "আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি, এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে।' (রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৫৫৬)

শ্রেণিচেতনার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সমাজবৈষম্যের অবসান করা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মতাদর্শের অনুরূপ ছিল না। এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি স্মর্তব্য :

> রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক নন, অর্থনীতিবিদও নন। স্বভাবতই এদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা শাসক বনাম শোষিত তথা জনসাধারণের দ্বন্দ্ব এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী-বৈষম্যের দ্বন্দ্ব নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে যাননি। বরং শিল্পীসুলভ উদার মানবিক চেতনায় ভর দিয়ে পল্লীর শোষিত মানুষের এবং সার্বিক হিসাবে দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপায় খুঁজেছেন এবং এই পথেই সফলতা-ব্যর্থতারও হিসাবনিকাশ করেছেন। (হারুন, ১৯৯৪ : ৩৮)

রাবীন্দ্রিক আদর্শের সঙ্গে বস্তুবাদী অর্থনৈতিক চিন্তা এবং বিপ্লবী মতাদর্শের আন্তরিক সাযুজ্য ঘটেনি। দেশ ও মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি উদারনৈতিক, বিপ্লবাত্মক নয়। রেনেসাঁসীয় মূল্যবোধের সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা এবং ঔপনিষদিক দর্শনের সমীকরণে গড়ে

উঠেছে কবির মানবোপলব্ধির ধারণাটি। তবে ইতিহাস ও সমকালের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যে গভীর সখ্য ছিল, তার প্রমাণ ইংরেজদের নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর সরব প্রতিবাদ এবং নানা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে (১৯০৫) অংশ নেওয়া, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন, হিজলী হত্যাকাণ্ডের (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১) বিরুদ্ধে কোলকাতার মনুমেন্টের পাদদেশে বক্তৃতা করা, ফ্যাসিজমের তীব্র নিন্দা (১৯২৬) প্রভৃতি প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে গভীর মানবিক রবীন্দ্রনাথের ছবিটি বেরিয়ে আসে।

১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের *মানুষের ধর্ম*। *মানুষের ধর্মে* রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করেছেন মানুষের সত্যিকারের পরিচয় এবং খুঁজে বেরিয়েছেন মনুষ্যত্বের অন্তর্গূঢ় দিক। এ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মানবকেন্দ্রিক চিন্তার কিছু প্রান্ত উন্মোচিত হয় :

> ক) মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব। (রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৬২১)
> খ) মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব। (রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৬২১)

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিকতার বৈশ্বিক আধিপত্যের কালে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিমাত্রই মনে-মননে প্রভাবিত হয়েছেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার রবীন্দ্রসৃষ্টিকেও সমানভাবে আলোড়িত করেছে। প্রভূত কল্যাণে এবং হৃদয়ের ঐশ্বর্যে মানুষকে আত্মীয় করে নেবার প্রাচ্য ঐতিহ্যের পাশাপাশি রোমান্টিক জীবনদৃষ্টির সহজাত প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বিচার করেছেন। ঔপনিষদিক আদর্শে পরিস্নাত রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলময় বিশ্বানুভূতির পটভূমিকায় মানুষের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন সেই পরম সত্তাকে যিনি প্রাত্যহিকতার ধূলিমলিন বাস্তবে তৈরি করেন অতীন্দ্রিয় ভাবময়তার অনুভূতি। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

> মনুষ্যত্বের 'পরে কবির ছিল অবিচল আস্থা। শুধু তাহাই নয়, মানুষকে তিনি বিরাট মহিমান্বিত ভূমিকায় স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। মানুষকে তিনি কখনও ক্ষুদ্র, দুর্বল ও অসহায়রূপে দেখেন নাই পরন্তু মানুষের অসীম আত্মিকশক্তিতে তিনি বিশ্বাস করতেন আর এই বিশ্বাসের পশ্চাতে তাঁহার মনে যে দৃঢ় প্রত্যয়টি ছিল তাহা হইল যে, মানুষ একটি অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন জীব। (নেপাল, ১৯৯১ ২৭৩)

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বিশ্বাস একদিন বিচূর্ণ হয়ে যায় পাশ্চাত্যের উদগ্র লোভ ও সীমাহীন বর্বরতার কাছে। কারণ :

> সাম্রাজ্যবাদের ও ফ্যাসিবাদের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করেছেন, তার মূলে কাজ করেছে মানবতা। (হাসনাত, ১৯৮৭ : ২৬৮)

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসভঙ্গের কারণটি নিশ্চয়ই আর্থ-রাজনৈতিক। কিন্তু মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যে কিছু দায়বোধ আছে, সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিটি মানুষ কখনো কখনো হয়ে উঠতে পারে বিশ্বমানব; বিপন্নতা থেকে, মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে, সংগ্রামে কিংবা তীব্র মানবীয় সংকটে মানুষকে জেগে উঠতে হয় অন্তরগত শক্তিতে, মানুষ হিসেবে এই তাগিদ রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে বোধ করেছেন। আত্মসুখে বিমুগ্ধ হওয়া নয়, পরার্থবোধে উদ্বুদ্ধ হতে না পারলে মানুষের মহৎ পরিচয়টি শেষ পর্যন্ত অপরিস্ফুট অসম্পূর্ণ থেকে যায় রবীন্দ্রনাথ তা সর্বতোভাবে জানতেন। এই অসম্পূর্ণতার বেদনা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন :

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।
(রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ১২২)

'অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে চলে যাবার' মুহূর্তে কবি সচেতনভাবেই শুনতে পান ইতিহাসের অলঙ্ঘনীয় আহ্বান। সভ্যতার প্রতি, ইতিহাসের প্রতি বিমুখ থেকে নিশ্চেষ্ট জীবনযাপন কোনো সম্মান বয়ে আনে না। মানুষের মধ্যেই অধিষ্ঠান করে অনমনীয় বীর। মানবিক বিপর্যয়ে কিংবা ইতিহাসের ক্রান্তিকালে এই নিভৃত বীর জেগে ওঠে সর্ববন্ধন ছিন্ন করার দুর্জয় প্রত্যয়ে। আত্মসর্বস্ব বা সংগ্রামভীত মানুষকে ইতিহাস দেয় না কোনো মূল্য। আত্মজীবনে এই গ্লানি বহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত হননি কবি :

বাজল ভেরি,
তবু জাগল না রণদুর্মদ
এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে;
ব্যূহ ভেদ করে
স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম-সহকারিতায়।
(রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ১২৩)

ব্যক্তিজীবনে কবি মহৎ প্রাণের অসামান্য বীরত্বকে প্রণতি জানিয়েছেন, কিন্তু আত্মজীবনে সেই দুর্লভ মহিমাকে ধারণ করতে পারেননি। মৃত্যু আর বিসর্জনের কঠোর ত্যাগের মাধ্যমে রক্তলিপ্ত জগৎকে যারা অমরাবতীতে পরিণত করেছেন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সেই মানুষই ইতিহাসের স্রষ্টা। সাহিত্যের ব্যাপ্তলোকে অগণ্য মানুষের স্বরূপ চিত্রিত হলেও বাস্তবের সংঘাতে জর্জরিত মানুষ যখন সময়ের দাবিকে মেনে নিয়ে বৃহত্তর মানবতার মুক্তির জন্য নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে তখন তারাই হয়ে ওঠে যুগের নির্মাতা। সমষ্টির জন্য এই দায়বদ্ধতাকে রবীন্দ্রনাথ মানবিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেছেন :

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি

ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়;
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে —
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।
(রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ১২৩)

রবীন্দ্রনাথের মানবকেন্দ্রিক ধারণার পরিস্ফুটনে তাঁর পুরাণ-আশ্রয়ী রচনার স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। পুরাণের প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমাজতত্ত্ব ও মানবতত্ত্বের যৌক্তিক অনুষঙ্গসমূহকে অন্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের সন্ধান করেছেন আজীবন, মনুষ্যত্বের আলোকদীপ্ত রূপ অন্বেষণে তিনি পুরাণ, ইতিহাস, প্রচলিত কাহিনি, উপাখ্যান এবং কিংবদন্তির বর্ণাঢ্য পরিপ্রেক্ষিতে বিচরণ করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে রবীন্দ্রসৃষ্টির বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারকে, যেখানে বিশেষত পুরাণ-ইতিহাস-উপকথার গর্ভে লুকিয়ে থাকা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-সৌন্দর্য ও মহত্ত্বকে তিনি অনন্যতা দিয়েছেন। মানুষ সম্পর্কে এই পর্যবেক্ষণের নেপথ্যে রয়েছে তাঁর নিগূঢ় সমাজভাষ্য। শাস্ত্র-বর্ণ-কৌলীন্যের পাটাতনে নিষ্পিষ্ট অনভিজাত মানুষের অপরিসীম বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিপ্রতীপ দুই শ্রেণির অর্থাৎ অভিজাত রক্তের অধিকারী এবং সমাজের প্রান্তিক স্তরে বিরাজমান অভাজন-ব্রাত্য মানুষের বৈরী দ্বন্দ্বের রূপ।

কথা (১৩০৬), *কাহিনী* (১৩০৬), *পুনশ্চ* (১৩৩৯), *পত্রপুট* (১৩৪৩) প্রভৃতি কাব্য, *অচলায়তন* (১৩১৮), *মুক্তধারা* (১৩২৯), *রক্তকরবী* (১৯২৬) প্রভৃতি নাটকে মানুষের বহুমাত্রিক রূপ-মহিমার সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। *কথা, কাহিনী* কাব্যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বর্ণ-বিভাজিত রূপ, মনুষ্যত্বের অবমাননা এবং মানব-পরিচয়ের নানা নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতাকে মন্থন করে রবীন্দ্রনাথ মানুষের এক উচ্চ আদর্শিক রূপকে তুলে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় নির্বাচন করেছেন প্রাক্-ইতিহাস ও ঐতিহাসিক পর্বের কালপর্যায়কে — যেখানে বর্ণ ও ধর্মের পরিচয়ে বিভাজিত হয়েছে মানুষের শাশ্বত পরিচয়টি। প্রাচীন প্রদোষে বর্ণপ্রথার কঠোর বিধানে মানুষের যে নির্দয় লাঞ্ছনা হতো, সমাজ-স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষের অন্তর্লোকে যে গভীর বেদনা অনুরণিত হতো, রবীন্দ্রনাথ সেই অনুশাসনতাড়িত মানুষের পরিচয়কে তুলে এনেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, যে-ধর্ম মানবকে সংকুচিত করে, মনুষ্যত্বের পরিচয়কে উপেক্ষা করে কিংবা সর্বজনীনতার নীতিটি যে শাস্ত্রে অস্বীকৃত হয় তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায় তাঁর রচনায়। বৌদ্ধ ধর্ম, *মহাভারতের* সময়কাল এবং সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত কিংবা বৈদিক সময় ও বৈদিকোত্তর সমাজের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনা ভিন্নতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

কথা, কাহিনী কাব্যে মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি চিরায়ত মূল্যচেতনায় উদ্ভাসিত। মানবকেন্দ্রিক এই চিন্তা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দোলাচলবিদ্ধ হলেও ঔপনিষদিক কবি মানুষকেই জেনেছেন আরাধ্য হিসেবে। বস্তুত

মানবভাবনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ক্রমবিকশিত হয়েছে — পৌরাণিক অনুষঙ্গ থেকে আধুনিক সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নানা অবয়ব-আচরণ বর্ণিত হলেও মানবভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ধ্রুব এবং স্থিতপ্রজ্ঞ। রবীন্দ্র-কাব্যের এক বিশেষ পর্বে পৌরাণিক ভারতের জগৎ-জীবন-মানুষকে আশ্রয় করেছেন কবি। পৌরাণিক প্রথার যূপকাষ্ঠে অপচিত মনুষ্যত্বের মধ্যে মানবমহিমার নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন কবি। সেই প্রাচীন বর্ণকেন্দ্রিক অবরুদ্ধ সমাজ সম্পর্কে ড. অতুল সুর বলেছেন —

> মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে যে-সমাজের চিত্র দেওয়া হয়েছে তা চতুর্বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ। সেটা পিতৃকেন্দ্রিক সমাজ। সে সমাজে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। চতুর্বর্ণ বলতে মৌলিক চারটি শ্রেণীকে বোঝাত —ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। (অতুল, ১৯৮৮ : ১৭১)

সে সমাজে নারীর কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না বলেই *কথা* কাব্যের 'ব্রাক্ষণ' কবিতায় জবালা নিক্ষিপ্ত হয় সামাজিক নিরস্তিত্ববোধে। একমাত্র পুত্র সত্যকামকে ব্রক্ষ্যবিদ্যা লাভের জন্য সরস্বতী নদীতীরে ঋষি গৌতমের আশ্রমে পাঠিয়েছিল স্বামীহীনা জবালা। বালক সত্যকামকে দেখে মহর্ষি গৌতম প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা ছিল —

> কুশল হউক সৌম্য। গোত্র কী তোমার ?
> বৎস, শুধু ব্রাক্ষণের আছে অধিকার
> ব্রক্ষবিদ্যালাভে।
> (রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ২৪)

অভিজাত ব্রাক্ষণ্য সমাজে শিক্ষার অধিকার এভাবেই নিরঙ্কুশ করা হয়েছিল একটি শ্রেণির জন্য। সমাজ-সভ্যতার আধুনিকায়নের ফলে সাম্প্রতিক সমাজেও বিশেষায়িত শিক্ষার সুবিধা পায় অপেক্ষাকৃত ধনিক বিত্তবান গোষ্ঠী। অপ্রস্তুত সত্যকাম পিতৃপরিচয় জানার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোতে পিতার পরিচয় ছাড়া বিদ্যাদান ছিল নিষিদ্ধ। মা জবালার কাছে পিতার পরিচয় এবং গোত্র জানতে চায় বালক সত্যকাম। জবালার মধ্যে এ পর্বে জেগে ওঠে প্রতিস্পর্ধী এক নারী। প্রথানুগত্য থেকেও অস্তিত্বের প্রবল তাগিদে কেউ কেউ সমাজবন্ধনকে ভেঙে তৈরি করে সমাজের নতুন আদল। জবালা যেন সময়-অতিক্রমী একটি চরিত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈরিতা ও প্রতিকূলতাকে সে অগ্রাহ্য করার প্রত্যয় দেখিয়েছে। বিব্রত পুত্রের প্রশ্নের জবাবে সে বলেছে :

> যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
> বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
> জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
> গোত্র তব নাহি জানি তাত।
> (রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ২৪)

বৈদিক সে সমাজে নারীর বহুগামিতা নিন্দনীয় পাপাচার বলে প্রচলিত ছিল। কারণ এ কবিতায় দেখা যায়, সুবোধ বালক সত্যকাম যখন পুনরায় গুরুগৃহে এসে মায়ের এই স্বীকারোক্তি ঋষি গৌতমকে শোনায় তখন আশ্রমের প্রতিটি বিদ্যার্থী তাকে বিদ্রূপ করেছে, উপহাস করেছে, হাস্যরসিকতা করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানবধারণার প্রতিভূ হয়ে দেখা

দিয়েছেন মহর্ষি গৌতম। বিদ্যা বা জ্ঞান প্রদীপ্ত সূর্যের মতো, তা নির্বিশেষে আলোকিত করে সর্বমানবকে। বালক সত্যকামের সরল উক্তি শুনে সবাই যখন কুৎসায় মুখর তখন ঋষি গৌতম এসে চিরন্তন মনুষ্যত্বকেই স্বীকৃতি দিলেন :

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন,
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।
(রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ২৬)

পৌরাণিক সমাজে বহুগামিতার অজস্র উদাহরণ থাকলেও আলোচ্য সমাজবৃত্তটি শাস্ত্রীয় বিধানের এবং বর্ণবিভাজনের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ছিল না। ড. অতুল সুরের আরও একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

> বস্তুত বেদোত্তরকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চারিজাতির মধ্যে পার্থক্য যখন ঘনীভূত হয়েছিল, তখন থেকেই জাতি সম্বন্ধে তাদের মনে একটা গোঁড়ামির সঞ্চার হয়েছিল। তখন তাদের মনে রক্তের বিশুদ্ধতা, আচার-ব্যবহারের শুচিতা প্রভৃতি প্রাধান্যলাভ করল। এমনকি ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে শুচিতা রক্ষার জন্য বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠল। (অতুল, ১৯৮৮ : ১৭৫)

এই শুচিতা রক্ষার আন্তরগরজ থেকে ব্রহ্মবিদ্যাকে ব্রাহ্মণদের জন্য একচেটিয়া করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যে শাসিত হতো যে-সমাজ, চরিত্রগতভাবে তা বৈষম্যমূলক হতে বাধ্য। ব্রাহ্মণরা নিজেদের মনে করত ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত। কিন্তু এই পর্যায়েই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনার স্বরূপটি। ঋষি গৌতম যেন রবীন্দ্র-সত্তারই প্রতিরূপ। প্রথাগত সমাজ-অনুমোদিত বিদ্যাই শেষ কথা নয় — সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত, সত্য প্রকাশে অকম্পিত মানব তথাকথিত প্রকৃত ব্রাহ্মণের চেয়েও মহৎ। ব্রাহ্মণ্যত্ব অপেক্ষা মানবীয় সততা অবিনশ্বর ও আলোকদীপ্ত। রবীন্দ্রনাথ মানুষ বলতে এই সত্যের বিভায় প্রোজ্জ্বল মানবসত্তাকেই মুখ্য বলে জেনেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাচীন ধর্মীয় উপাখ্যান বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মোপাখ্যান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এই উপাখ্যানগুলোকে রবীন্দ্রনাথ প্রচল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচার করেননি। এই ধর্মকথা মানুষের স্বাভাবিক প্রাণ ও বিকাশকে অবদমিত বা ক্ষয়িষ্ণু করেনি। বরং ধর্মের প্রচ্ছদ দীর্ণ করে মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্বের প্রজ্ঞাময় আদল। ধর্মের বাণীর চেয়ে মানবিক কীর্তির কথা রবীন্দ্রনাথ উঁচু সুরে ঘোষণা করেছেন এ ধরনের কবিতায়। *কথা* কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতায় এক দীন নারীর শেষ বস্ত্রখণ্ড দানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনার অন্য দিক উন্মোচিত হয়েছে। অবদানশতক থেকে এই উপাখ্যানটি গৃহীত হয়েছে। মানুষ যে কতটা আত্মলোপী হতে পারে, মানুষ কত অনায়াসে পারে সর্বস্বত্যাগী হতে, কোনো মোক্ষলাভ নয়, কেবল দানের ঐশ্বর্যে আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে জ্যোতির্ময় মানব — এই কবিতায় সে অভিজ্ঞতা চিত্রিত হয়েছে। শ্রাবস্তীপুরীর ধনিক শ্রেণি গৌতম বুদ্ধের জন্য ধনরাজি নিয়ে এসেছে, কেউ বা ভারে ভারে নিয়ে এসেছে রত্নকণিকা। কিন্তু

ধনের ঐশ্বর্যে বুদ্ধের সন্তোষ পাওয়া যায়নি, সর্বস্ব ত্যাগের মহিমা ধনের মূল্যে বিচার্য হতে পারে না। কিন্তু অরণ্য-আড়ালে নিজের সম্ভ্রম লুকিয়ে এক নারী নিজের শেষ বস্ত্রখণ্ড বিলিয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।
(রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ২১)

'সামান্য ক্ষতি' কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে জোরালো হয়ে উঠেছে দুটি শ্রেণি ও অবস্থানের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। কাশীর মহিষী করুণা প্রথাগত রাজন্য-চেতনা থেকে বিচার বা প্রত্যক্ষ করেছেন প্রান্তিক জনমানুষকে। শীত নিবারণের জন্য প্রজাকুলের গৃহ ভস্মীভূত করার মধ্যে মহিষী অনুভব করেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে আচরিত রাজশক্তির দম্ভ ও ক্ষমতাকে। তাই সামান্য শীতের তাড়নায় রানী আদেশ করেছেন —

'ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল'
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।
(রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৪২)

মহিষীর বিত্ত-বিলাসিতা আর অহমিকার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা উচ্চবর্গীয় শ্রেণির ক্ষমতাকেন্দ্রিক মানসিকতা। নৃপতির প্রমোদ আর ইন্দ্রিয়চর্চার উপঢৌকন জোগাতে প্রজাকুল ব্যাকুল থাকবে — ইতিহাসের দীর্ঘ প্রচ্ছদে এই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তাই কাশীর মহিষীর উচ্চারণ অভিজাত ক্ষমতাধরদের কণ্ঠকে স্মরণ করিয়ে দেয় —

রুষিয়া কহিল রাজার মহিষী,
গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে!
(রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৪৩)

এই এক প্রহরের প্রমোদের জন্য রসদ জোগাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়েছে অগণ্য সাধারণ নরনারী। সমাজবিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে একটি শ্রেণি। পরশ্রমজীবী এই শ্রেণিরই প্রতিফলন ঘটেছে রানী চরিত্রে। কিন্তু রাজন্যের দর্প আর নিপীড়িতের হতাশ্বাসের চিরায়ত দ্বন্দ্বের মধ্যে ভিন্নতর উচ্চতায় রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন মানুষের আশাবাদী জ্যোতির্ময় রূপ। রাজা চরিত্রের আচরণ আদর্শায়িত মনে হলেও অসম্ভব নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মানব-ধারণার

সামগ্রিকতায় মিশে আছে মনুষ্য-অবয়বের সেই উজ্জ্বল রূপ, যেখানে নিবিড়ভাবে মিশে থাকে ব্যক্তির আদর্শবোধ, দায়িত্বসচেতনতা, কল্যাণকামিতা এবং মঙ্গলময়তার অনুভব। এই গভীর আত্মোপলব্ধি থেকে রাজা নিজের স্ত্রীকেও রেহাই দেননি :

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে–
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-কটি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পার সে-কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।'
(রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৪৪)

কাশীর নৃপতি রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনার আদর্শিক প্রতীক। প্রজার প্রতি তার সদাশয়তা ও বদান্যতা রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যভাবনার ঐকান্তিক দিক। রাজা শেষ পর্যন্ত প্রজা-অনুরক্ত বা বেনিভোলেন্ট হয়ে ওঠেন এবং রানীর জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন তা প্রচল ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, হয়ত বিস্ময়করও। শ্রমে ও বেদনার মধ্য দিয়ে যে মানবজীবন নির্মিত হয় তার প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে নৃপতির, মানবনিষ্ঠায় স্থিতধী এই নৃপতিই রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট মানুষ।

অভিজাত রাজা আর ব্রাত্য ভৃত্যের এক ভিন্নরকম দ্বন্দ্ব শৈল্পিক মাত্রা লাভ করেছে 'নকল গড়' কবিতায়। চিতোর থেকে মাত্র তিন যোজন দূরে তৈরি নকল বুঁদির কেল্লাটিকে ধ্বংস করার জন্য চিতোরের রানা প্রস্তুতি নিয়েছে। বুঁদির কেল্লা হলো হারাবংশী গোত্রের জাতীয় অহঙ্কারের প্রতীক। বুঁদির কেল্লা দখল করার জন্য বহু রাজন্য নানা সময়ে আক্রমণ করেছে কিন্তু সফল হতে পারেনি কেউ। সুতরাং চিতোরের রানাও পারবেন কিনা এই আশঙ্কা থেকে চতুর মন্ত্রী মাটি দিয়ে নকল বুঁদির গড় নির্মাণ করেন। কিন্তু ক্ষুদ্রতম অধম হারাবংশীরও মনে অবিনাশী আলোর মতো জেগে থাকে স্বজাতির উজ্জ্বল গৌরবগাথা। রানার ভৃত্য হারাবংশী রাজপুতের সন্তান কুম্ভ শপথ নেয় নকল হলেও মাটি দিয়ে তৈরি বুঁদির কেল্লার কোনো অসম্মান সে হতে দেবে না। কুম্ভর এই প্রতিজ্ঞার অন্তরালে ফুটে ওঠে নির্জিত ব্রাত্যের অহং এবং ঐতিহ্যবোধ। কুম্ভ হারাবংশী রাজপুতের সন্তান হলেও তার ভৃত্য পরিচয়টি তাকে ঠেলে দেয় উপেক্ষিত নিম্নবর্গে। ফলে বুঁদির কেল্লার অপমান সে নীরবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সে প্রতিজ্ঞা করে — যে-কোনো মূল্যে সে নকল বুঁদিগড় রক্ষা করবে।

রবীন্দ্রনাথের মানবচেতনার অবিচ্ছিন্ন অংশ মানুষের স্বাধীন অস্তিত্বে বিশ্বাস, তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যে আস্থা এবং ব্যক্তির অকুতোভয় মৃত্যু-অতিক্রমী অগ্রযাত্রা। তাই কুম্ভর প্রাণ বিসর্জনে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির ক্ষয় বা বিনষ্টি প্রত্যক্ষ করেন না, তিনি অনুভব করেন নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণের মহিমান্বিত আত্মোৎসর্গের অহঙ্কার। ক্ষুদ্রতার মধ্যে, তুচ্ছতার মধ্যে মানুষের সত্যিকার মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না — বৃহতের মধ্যে মানুষ তার গৌরবময় সত্তাকে অনুভব করে। তাই কুম্ভ প্রাণের বিনিময়ে রেখে যায় এক ব্রাত্যের অমলিন ঐশ্বর্যের কীর্তিকথা :

ভূমির পরে জানু পাতি
তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।
রানার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলাঘরের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি-পর।
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।
(রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৪৩)

অভিসার কবিতার উপাখ্যানটি বোধিসত্ত্বাবধান-কল্পলতা থেকে উদ্ধৃত। শুদ্ধচারী সন্ন্যাসী উপগুপ্ত এবং এক পতিতা নারী বাসবদত্তার কাহিনির মধ্য দিয়ে অভিজাত ও ব্রাত্যের সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এ উপাখ্যানে উপগুপ্তের শাস্ত্রীয় আভিজাত্য ও বাসবদত্তার কোমল মানবীয় রূপের ঐকান্তিক বন্ধনটিকে রবীন্দ্রনাথ অনন্য মহিমায় চিত্রিত করেছেন। উপেক্ষিতা অনাদৃতা বাসবদত্তার হার্দ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি সন্ন্যাসী উপগুপ্তের বিশাল হৃদয়ের ঔদার্য রবীন্দ্রনাথের মানবধারণার স্বরূপটিকে উন্মোচন করে। মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে কঠিন ভূমিতে শয্যাগ্রহণকারী সন্ন্যাসীর গায়ে চরণ স্পর্শ করতেই বাসবদত্তা বলেছিলেন —

ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর
দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার শয্যা।
(রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩২)

যৌবনপ্রমত্ত নগর-নটির রূপ-সুধায় মজে বহুজন তার সান্নিধ্য ভোগ করেছে। কিন্তু বহমান কালের মতোই নারীর রূপ-ঐশ্বর্যও পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মতো একদিন মিলিয়ে যায়। একদিন যারা বাসবদত্তার সঙ্গলিপ্সু ছিল মারীগুটিকায় অঙ্গ ভরে ওঠায় তারাই তাকে নির্মমভাবে পথের পাশে ফেলে রেখে যায়। ব্যাধি তার শরীরে রেখে যায় কালো বর্ণ, ফলে তার সঙ্গ হয়ে ওঠে বিষাক্ত, মধুলোভী সঙ্গীরা পুরপরিখার বাইরে বাসবদত্তাকে ত্যাগ করে। রবীন্দ্র-ভাবনায় মানুষ হলো অমৃতের সন্তান। ঔদার্যে, মহত্ত্বে , সেবায় আর কল্যাণে মানব-অবয়বের মধ্যে তৈরি হয় শাশ্বত মানব। এ কারণে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত একদিন যাকে অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন ভোগ-ঐশ্বর্যের মোহ কাটিয়ে, অন্তর্গত ভালোবাসার শক্তিতে, তিনিই এসে দাঁড়ালেন পতিতা বাসবদত্তার পাশে —

ঝরিছে মুকুল, কুজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয় —

'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা।'
(রবীন্দ্রনাথ (১৪), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩৪)

ত্যাগের মধ্যে, নিবেদনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণের দ্বারা সন্ন্যাসী উপগুপ্ত পতিতা ব্রাত্য নারীর নিঃসহায় অবস্থায় পরম আশ্রয় হয়ে উঠলেন। দীন-দুঃখীর ব্যক্তিগত বেদনার সঙ্গে কবি নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে নেমে আসেন বৃহত্তর মনুষ্যত্বের আলোয়।

মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' কবিতায় অভিজাত ও ব্রাত্যের দ্বৈরথ ধ্রুপদী মহিমা লাভ করেছে। কর্ণের জন্ম-ইতিহাসের মধ্যে নিয়তির যে লাঞ্ছনা নিহিত ছিল, তার সমস্ত মানবিক অসাধারণত্ব সত্ত্বেও সেই জন্ম-অশুচিতার গ্লানিমোচন হয়নি। অভিজাত রাজবংশের উচ্চমার্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কর্ণের জীবন ও বাস্তবতাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ঋষি দুর্বাসার পরামর্শে তারই শেখানো মন্ত্র কৌতূহলবশত উচ্চারণ করে একদা কুন্তী সূর্য দেবতার মাধ্যমে লাভ করেন কর্ণকে। কুমারী অবস্থায় এ পুত্র জন্ম নেওয়ায় কুন্তী কলঙ্কের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন এবং সামাজিক ভীতির কারণে একটি পাত্রে নিয়ে কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তার পত্নী রাধা সেই পুত্রকে উদ্ধার করে পুত্রস্নেহে পালন করেন। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং সূর্যোপাসনায় কঠোর ব্রতী হলেন কর্ণ। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় এই কর্ণই কুরুপক্ষের সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কর্ণের সমগ্র জীবনের পটভূমিকায় অন্তঃশীলা বেদনার মতো ছড়িয়ে আছে নামপরিচয়হীন ব্রাত্য জীবনের অবজ্ঞা। প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক সমাজ অভিজাততন্ত্রকে পছন্দ করে, পক্ষ নেয় উচ্চ রাজশক্তি ও কৌলীন্যের। সে-কারণেই হস্তিনানগরে অস্ত্রপরীক্ষার দিনে কৃপাচার্য কর্ণকে উপহাস করে বলেছে—

রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার—
(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯২: ৩৯৭)

অনতিবিলম্বে দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করে বটে কিন্তু তার ললাট থেকে অনভিজাতের কলঙ্কমোচন হয় না। জননী-পরিত্যক্ত কর্ণ তীব্র মানবীয় যন্ত্রণা থেকে মাতা কুন্তীকে বলেছে—

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে—
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে?
(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯২: ৪০০)

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় কর্ণ যেন নতুনভাবে উপলব্ধি করে তার জন্ম-পরিচয়কে। মাতা কুন্তী এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রাক্কালে কর্ণ-সমীপে উপস্থিত হন এই উদ্দেশ্যে যে, কর্ণ যেন কুরুপক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। কর্ণ বাহুবলে প্রমাণ করতে চায় তার শক্তি ও বীর্যবত্তাকে। রাজন্যের আশ্রয়বিচ্যুত কর্ণ যে সূতজননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়েছে, নিজের সুখের দিনে তাকে বিস্মৃত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় কর্ণের পক্ষে। এখানেই কর্ণের মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় মানবিক দায়বদ্ধতা এবং কৃতজ্ঞতার উপলব্ধি থেকে। রক্তীয় বন্ধনের চেয়ে প্রখর হয়ে ওঠে আবেগের বন্ধন। কর্ণ বলেছে :

সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি,
কুরুপতির কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে —
তবে ধিক্ মোরে।
(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯২ : ৪০২)

জন্মের পরে কর্ণকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেও পুত্রস্নেহের নির্মম বেদনা কুন্তীকে মর্মে মর্মে অনুভব করতে হয়েছে। কর্ণ চরিত্র পৌরাণিক ভারতের এক অনবদ্য চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও কর্ণের মানবিক অস্তিত্বের মধ্যে মিশে রয়েছে নমিত বেদনা, অনুক্ত অভিমান এবং সত্যিকারের বীরত্বব্যঞ্জক অভিব্যক্তির অহংকার। বলে-বীর্যে-শক্তিতে এবং প্রতাপে পরাক্রমশালী হলেও কর্ণ তাঁর আত্মজৈবনিক যন্ত্রণা অপনোদনে ছিল নিরুপায়। একদিকে মাতৃস্নেহ এবং অন্যদিকে আশ্রয়দাতা প্রতিপালকের অপত্যস্নেহের ঋণ — এই দ্বন্দ্বের মীমাংসায় উৎপীড়িত কর্ণ সত্যিকারের বীরের পরিচয়ই দিয়েছে। প্রকৃত বীরত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে সূক্ষ্ম মানবিক দায়। অন্নদাতার ঋণ পরিশোধেই কর্ণ খুঁজে নিয়েছে তাঁর ব্যক্তিক মুক্তির উপায়। এ কারণে রাজা হবার প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছে সে অনায়াসে, সমস্ত সামাজিক-মানবিক আকর্ষণ উপেক্ষা করে কর্ণ বেছে নেয় তার তার উপেক্ষা ও নৈঃসঙ্গ্যের বেদনা :

আমি রবো নিষ্ফলের হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।
(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯২: ৪০৩)

কর্ণ চরিত্র নির্মাণে প্রাচীন মহাভারতকার মানবীয় গুণাবলির ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন — প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে নিরাসক্তি, বীতমোহ, আত্মনিবেদন, নিষ্কামচেতনা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণের যে সমন্বয় কাম্য, কর্ণ-চরিত্র তার শৈল্পিক প্রকাশে অনন্য। সংবেদনশীল

অভিমানী মানবসত্তার বেদনা ধরা পড়েছে কর্ণ চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথের মানবসম্পর্কিত ধারণার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে কর্ণ-চরিত্রটি প্রোজ্জ্বল।

পুনশ্চ কাব্যে (১৩৩৯) রোমান্টিক আবেগের নির্বন্ধন প্রকাশ সত্ত্বেও মানুষের সর্বজনীন মহিমা ভাষারূপ লাভ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-মুহূর্তে মানবসভ্যতার ভবিতব্য নিয়ে আতঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে যে-রোমান্টিকতার কল্পজগতে কবি একদা নিমগ্ন ছিলেন তিনি বাস্তবতার দুর্লঙ্ঘ্য আহ্বানে সর্বশ্রেণির মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। অস্পৃশ্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের বৃহত্তর মানবিক মহিমা।

'শুচি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নানসমাপন', 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন মহামানবের এবং মহামনুষ্যত্বের অমৃত রূপের সন্ধান করেছেন। *পুনশ্চ* কাব্যে অস্পৃশ্য মানুষের প্রতি কবির এই মর্মবেদনার নেপথ্যে সমকালীন ভারতে মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *পুনশ্চ* কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে এবং এই সময়েই গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশাধিকারের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইলেন। একই সঙ্গে বিরোধ তৈরি হলো কেরালার অন্তর্গত গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার নিয়ে। কেলাপ্পান নামক গান্ধীজীর জনৈক অনুগামীই ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। গুরুভায়ুর মন্দিরে প্রবেশ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান না হলে গান্ধীজী নিজেই কেলাপ্পানের সঙ্গে পুনরায় অনশন করার ঘোষণা দেন। কিন্তু এই জটিলতা কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। রবীন্দ্রনাথ কালিকটের রাজা জামোরিনকে পত্র লিখে গুরুভায়ুর মন্দিরে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি রচনা করেন 'শুচি' কবিতাটি। এই সময়েই বাংলার 'প্রবর্তক সঙ্ঘের' নেতা মতিলাল রায় অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং চন্দননগরে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন ১৯৩২ সালের ১১ ডিসেম্বর। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে রবীন্দ্রনাথ যে বাণীটি পাঠান তাতে তাঁর মানব-সম্পর্কিত ধারণার স্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে :

> দেহের কলুষ জলে ধুয়ে যায়, মনের কলুষ কোন বাহ্য স্নানে দূর হয় মনে করা মূঢ়তা। এই রকমের কলুষিত স্পর্শ আমাদের ঘরে বাইরে। দেহের কলুষকেই সমাজে প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত যদি মনে করা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, মলিন রোগে রক্তদূষিত ব্রাহ্মণকে কি সমাজ থেকে ও মন্দির থেকে নির্বাসিত করবার বিধি আছে? (নেপাল, ১৯৯১ : ২৬৪)

এই বাণীতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

> কোন জাতির হীনতা জন্মগত ও নিত্য, এ কথা মনে করাকে আমি অমার্জনীয় অধর্ম জ্ঞান করি। খৃস্টান শাস্ত্রে চিরনরকবাসের কল্পনা যেমন গর্হিত, কোন জাতিকে সমাজে চির-নারকী করে রাখাও তেমনি নিষ্ঠুর অন্যায়। (নেপাল, ১৯৯১ : ২৬৪)

প্রথাগত এবং সংস্কারজীর্ণ ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কখনই সমর্থন ছিল না। কিন্তু তারপরও তিনি এই মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এর প্রধান কারণ :

এই আন্দোলনকে তিনি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্রের ঘোরতর ধর্মীয় অন্যায় ও দুর্নীতিপরায়ণতার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের নির্যাতিত শ্রেণিগুলির একটি অতীব ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম হিসাবেই দেখছিলেন। তাছাড়া এই আন্দোলনে তাদের মধ্যে তিনি একটি সামাজিক চেতনা ও নবজাগরণের প্রথম সূচনাও দেখছিলেন। তাই এই পত্রে উপাসনার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর স্বীয় মত ব্যক্ত করেও তিনি নির্যাতিত হিন্দুশ্রেণির একটি অত্যন্ত মৌলিক ও ন্যায়সংগত অধিকার হিসাবেই মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন। (নেপাল, ১৯৯১ : ২৮৪-৮৫)

অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের এই পটভূমিকায় কবি অল্পকালের ব্যবধানে রচনা করেন 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নান সমাপন' নামে তিনটি কবিতা যেগুলো পরে *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিগত বিভাজন, ধর্ম ও বর্ণের তীব্র বিভেদ এবং মানুষে মানুষে অনেকান্ত ব্যবধানের বিষবাষ্পে কলুষিত জগতে কবি সর্বমানবিকতার আবাহনে ব্যাপৃত হলেন। ফলে প্রাচীন কিরাত জাতিও তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে উঠল প্রণম্য, ভাজন মুচির বাহ্য পরিচয় লুপ্ত হয়ে আশ্রয় পেল রামানন্দের উদার প্রশস্ত বক্ষে, চণ্ডাল নাভার সামাজিক অস্পৃশ্যতার জায়গায় বড়ো হয়ে দেখা দিল তার শুদ্ধ মানবীয় চৈতন্য। 'শুচি' কবিতায় গুরু রামানন্দ লোকস্থিতি রক্ষার নামে প্রান্তজনকে দূরে ঠেলে রেখেছিলেন আর প্রাণের ঠাকুরকে রেখেছিলেন বৈকুণ্ঠচারী করে। কিন্তু বৈকুণ্ঠে নয়, প্রাত্যহিক মানুষের মধ্যে মিলন-আনন্দের মিশ্র উপলব্ধিতে একাত্ম হয়ে থাকতে চান ঠাকুর। তাই ঠাকুরের এই উপলব্ধি গুরু রামানন্দের মধ্যে জন্ম দেয় ভিন্নতর মানবজিজ্ঞাসা। শাস্ত্রীয় বিধানের শৃঙ্খলে মানুষের যে শাশ্বত পরিচয় চাপা পড়ে গিয়েছিল সেই লুপ্ত বিস্মৃত মনুষ্যত্বের সন্ধানে একদা প্রথম প্রহরে রামানন্দ বেরিয়ে পড়লেন অজানা নগর ও গ্রামে। ধর্ম ও বর্ণের দুস্তর ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন উপেক্ষিত নাভা চণ্ডাল নতুন মহিমায় আদৃত হলো। তুচ্ছতার মধ্যে যে নাভা নিজেকে চিরাচরিতভাবে ভাবতে শিখেছে, মানবতার নতুন উদ্বোধনে সেই নাভাই জ্যোতির্ময় স্বরূপে দেখা দিল — ক্ষুদ্রতার বৃত্ত ভেঙে মনুষ্যত্বের বৃহৎ পরিসরে সে নিজেকে আবিষ্কার করল। রামানন্দের এই ঔদার্য রবীন্দ্রনাথের মানবধারণার অবিনাশী দিক এবং তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে রামানন্দের কণ্ঠে :

গুরু বললেন, 'অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাইনি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন —
নইলে হবে না মৃতের সংস্কার।'
(রবীন্দ্রনাথ (৮), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩০৩)

মানবতন্ত্রের বিস্মিত উদ্বোধনে অনাদৃত কবীরও পঙ্‌ক্তিভুক্ত হলেন রামানন্দের বৃহত্তর মানবধর্মে। প্রকৃতির সহজ সারল্যের মতোই রামানন্দ কবীরের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলেন। অথচ আত্মজগতে সংকুচিত কবীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠেছেন :

প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
(রবীন্দ্রনাথ (৮), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩০৩)

কবীরের স্পর্শ রামানন্দকে কলুষিত ক্লিন্ন করেনি বরং তার তৈরি বস্ত্র পরিধান করে রামানন্দ শুচিময় হয়ে ওঠার আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছেন। রামানন্দের এই মানবীয় সর্বজনীনতার সম্প্রসারণ ঘটেছে 'প্রেমের সোনা' কবিতায়। রবিদাস চামারের সামাজিক অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনার জায়গায় রামানন্দ নিয়ে আসেন অবারিত ভালোবাসার আমন্ত্রণ। এই ভালোবাসার অবাধ মুগ্ধতায় চিতোরের রানী ঝালিও প্রণতি জানান রবিদাস চামারকে। কিন্তু রানীর এই আচরণে চিতোরের ব্রাহ্মণ্য-আভিজাত্যই যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবহমান শাস্ত্রীয় সংস্কারের প্রতাপে গর্বোদ্ধত রাজকুল-পুরোহিত ধিক্কার দিলেন রানীকে। জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাসকে প্রণাম করায় ব্রাহ্মণের অহংকারকে ধূলায় লুণ্ঠিত করা হয় বলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে স্মৃতিশিরোমণি পুরোহিত। কিন্তু মানবধর্মে চিরপ্রত্যয়শীল রবীন্দ্রনাথ আত্মিক শুদ্ধতার মধ্যে এবং ধর্ম-প্রথার সর্ববন্ধনমুক্ত প্রাকৃত সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করেছেন মানুষের সত্যিকার অস্তিত্ব। এই বিশ্বাসেরই প্রকাশ ঘটেছে রানী ঝালির কণ্ঠে :

রানী বললেন, ঠাকুর, শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পার নি তা।'
(রবীন্দ্রনাথ (৮), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩০৭)

প্রেমের এই আনন্দময় পথ ধরে 'স্নানসমাপন' কবিতায় রামানন্দ গিয়ে উপস্থিত হয় অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পাড়ার ভাজন মুচির গৃহে। ভদ্রপল্লি থেকে সুদূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে ভাজন মুচির বসবাস সভ্য সমাজের কেউ সেখানে কখনো যায় না। তাই রামানন্দ পশুর চামড়ার গন্ধ উপেক্ষা করে রোগজীর্ণ কুকুরের ঘৃণ্যতাকে পাশ কাটিয়ে যখন ভাজন মুচির গৃহে উপস্থিত হন এবং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, হতচকিত ভাজন তখন বলেছে :

কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।
(রবীন্দ্রনাথ (৮), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩০৯)

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যেই দেখেছেন বিশ্বমানবকে। ব্যক্তির আত্মগত পরিচয়ের বাইরেও রয়েছে তার বিশ্বজনীন রূপ। রক্তের পার্থক্য ঘুচিয়ে, ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে, জাতি ও গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ব্যবধানকে মুছে দিয়ে মানবের বৈশ্বিক অস্তিত্বের রূপ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাগ্রসর। ভাজন মুচির প্রবল সংকোচ দেখে রামানন্দ তাই উদ্বোধিত হয়ে উঠেছেন মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় :

স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সেই বিশ্বপাবনধারা।
(রবীন্দ্রনাথ (৮), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩০৯)

ব্রাত্যজনের শ্রমে ও রক্তের মূল্যে অর্জিত দুর্লভ মহিমা অভিজাতশ্রেণির উপভোগে ব্যবহৃত হবার মর্মন্তুদ ইতিহাস 'প্রথম পূজা' কবিতাটি। অস্পৃশ্য কিরাত জাতির অমূল্য ত্যাগে ও নিষ্ঠায় একদা প্রতিষ্ঠিত মন্দির ইতিহাসের পরিবর্তনে আজ ক্ষত্রিয়-শ্রেণির অধিগত। কৃষ্ণশিলায় মূর্তি নির্মাণের ছন্দ যাদের করায়ত্ত সেই কিরাতেরা সমাজ থেকে নির্বাসিত এবং এ মন্দিরে তাদের প্রবেশপথও লুপ্ত। দৈবদুর্বিপাকে এই মন্দির বিধ্বস্ত হলে তার সংস্কারের দায়িত্ব পড়ে কিরাতদলপতি পলিতকেশ মাধবের উপরে। কিন্তু কিরাতের দৃষ্টিস্পর্শে অপবিত্র হয়ে যাবে দেবতার শুচিতা :

রাজা বললেন, 'সংস্কার করো।'
মন্ত্রী বললেন, 'ওই কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ।
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে।'
(রবীন্দ্রনাথ (৮), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩১২)

দেবমূর্তির উপর যাতে নজর না পড়ে এবং দেবতার অঙ্গমহিমা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য বৃদ্ধ মাধবের দুচোখ বেঁধে দেবমূর্তি নির্মাণ করার আদেশ দেন রাজা। বাইরে দিনরাত কাজ করে সাধারণ কিরাতেরা আর ভেতরে দেবমূর্তি নির্মাণে নিজের চারুনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে দলপতি মাধব। কিন্তু নিজের সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা খুঁজে নেয় নিজেকে, আপন শ্রমে গড়ে ওঠা অনিন্দিত প্রতিমায় শিল্পী মাধব অবলোকন করতে চায় সৃষ্টির আনন্দ। তাই শুক্লপক্ষের একাদশীর রাতে কৃষ্ণশিলার প্রতিমা নির্মাণের কাজ শেষ হলে বিস্মিত বিমূঢ় মাধব সেই মূর্তি দর্শনের প্রথম আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি। তাই :

মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী-চাঁদের পূর্ণ আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
(রবীন্দ্রনাথ (৮), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩১৩)

কিন্তু মানবসভ্যতার বিবর্তনে ইতিহাস প্রায়শ আনুকূল্য দেয় ক্ষমতাবান অভিজাতদের। ইতিহাস তৈরির নেপথ্যে তৃণমূল ব্রাত্যদের অবদান মুখ্য হলেও অভিজাতশ্রেণিই হয়ে ওঠে ইতিহাসের নিয়ন্তা। তাই কিরাতের স্বেদ ও শ্রমে গড়ে ওঠা ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির রক্তস্নাত হয় দলপতি মাধবের উষ্ণ শোণিতে। অতুলনীয় দৃষ্টিশোভন দেবতার সামনে মাধবের প্রণতি শেষ হবার পূর্বেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন রাজা :

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।
(রবীন্দ্রনাথ (৮), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩১৩)

অভিজাত ও ব্রাত্যের বিভাজনরেখা এ কবিতায় অনবদ্য রূপ লাভ করলেও রবীন্দ্রনাথের মানবচৈতন্যের মীমাংসিত বোধ অনুভব করা কষ্টসাধ্য নয়। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে রক্তের উত্তরাধিকারের চেয়ে কর্মের-প্রেমের ও আত্মিক উপলব্ধির প্রেরণা মানুষকে মানবত্বে পৌঁছে দেয় বলে প্রতীয়মান হয়। কিরাত জাতিকে ধর্মের বাহ্যিকতার দ্বারা দূরে ঠেলে দেওয়ার সব আয়োজন করেছে ক্ষত্রিয়কুল, কিন্তু মানবিক শ্রমের মূল্য ও গুরুত্ব যে অনন্য এবং সৃষ্টিশীলতার অনুপম স্পর্শে উপেক্ষিত অনার্য মানবকুল অভিজাতদের চেয়ে উচ্চমার্গীয়, এই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন রবীন্দ্রনাথ।

নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দুলকর্ণাবদানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে গৃহীত হয়েছে *চণ্ডালিকা* (১৩৪০) নাটিকার গল্প। *চণ্ডালিকা* নাটকে অভিজাত ও ব্রাত্যের বৈপরীত্য সত্ত্বেও সত্যিকার মানবধর্মের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রভু বুদ্ধের শিষ্য আনন্দকে দেখে চণ্ডালের কন্যা প্রকৃতি অজ্ঞাতসারেই প্রণয়াবিষ্ট হয়। তৃষ্ণায় কাতর আনন্দকে পিপাসার জল দিতে গিয়ে তার রূপে মুগ্ধ হয় প্রকৃতি। আনন্দকে পাবার জন্য প্রকৃতি নিরুপায় হয়ে মায়ের সাহায্য চায়। প্রকৃতির মা চণ্ডালিনী আদিম তন্ত্রসাধনা ও জাদুবিদ্যায় সিদ্ধ নারী। তিনি মন্ত্রসাধনা দ্বারা আনন্দকে প্রকৃতির অধিগত করলেও শেষ মুহূর্তে প্রভু গৌতমের কৃপায় ফিরে আসে আনন্দ। প্রাচীন তন্ত্রসাধনা ও জাদুবিদ্যার চর্চা অনার্য সংস্কৃতির পরিচায়ক। প্রকৃতির মাতৃ-রক্তের মধ্যে এই অনার্য সংস্কারের উপস্থিতি এবং তার অপপ্রয়োগ এবং তারই বিপরীতে গৌতম বুদ্ধের মহত্ত্ব ও ঔদার্যের নিরংকুশ প্রকাশ *চণ্ডালিকার* কাহিনিকে অভিজাত-ব্রাত্যের দ্বৈরথে পরিণত করেছে। প্রকৃতির মা সর্বতোভাবে কন্যাকে আনন্দের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেও প্রকৃতি তাতে সম্মত ছিল না। ধর্ম মানে কিনা জিজ্ঞাসা করলে প্রকৃতি উত্তর দিয়েছে — 'যে-ধর্ম অপমান করে সে-ধর্ম মিথ্যে।' (রবীন্দ্রনাথ (১২), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ২১৯)

প্রকৃতির মা জাদুবিদ্যার সম্মোহনীতে ভুলিয়ে আনন্দকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে আসলেও আনন্দের মনে একপর্যায়ে দেখা দেয় পরিতাপ। পরিত্রাণের জন্য বিধাতার কাছে ক্রন্দন করলে প্রভু গৌতমের কৃপায় স্বস্থানে ফিরে আসে আনন্দ। আনন্দ ও প্রকৃতির প্রভেদটি এখানে অভিজাত ও ব্রাত্যের। প্রভু গৌতমের মন্ত্রের শক্তিতে চণ্ডালিনীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেলে চণ্ডালিকার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দ গৃহে ফিরে আসে। ব্রাত্যের অশুচি স্পর্শ বাঁচিয়ে বৌদ্ধ কুলীনপুত্র যেন নিজ অধিকারে ফিরে আসে।

নটীর পূজা (১৩৩৩) নাটকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় অভিজাত-ব্রাত্যের বর্ণ-বিদ্বেষ এবং জাতিবৈর প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বসন্ত পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধের জন্মোৎসবে অশোকবনে পূজা নিবেদনের ভার পড়েছে নটী শ্রীমতীর উপর। কিন্তু রাজকন্যা রত্নাবলী এবং রাজমহিষী লোকেশ্বরী কিছুতেই বোধিসত্ত্বের পূজা মেনে নিতে পারছে না। বিশেষ করে রাজবাড়ির নর্তকী শ্রীমতী ভগবান বুদ্ধের চৈত্যে পূজা নিবেদন করবে এ সত্য মানতে তারা মোটেই প্রস্তুত নয়। রত্নাবলী বলেছে —

> ঐ নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায় তা হলে এই অশুচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না। (রবীন্দ্রনাথ (৯), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ২৩৪)

রাজমহিষী লোকেশ্বরী তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে বলেছেন —

> অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েছি। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে সেও সইতে পারি। কিন্তু রাজরানীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত ! (রবীন্দ্রনাথ (৯), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ২৩৪)

স্থবিরদের আদেশে শ্রীমতী পূজার এই অধিকার লাভ করলেও রাজকন্যা রত্নাবলী স্থবিরদের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ভিক্ষুণীর কথার উত্তরে রত্নাবলী তীব্র ভাষায় জানিয়েছে যে, উপালি হলো নাপিত, সুনন্দ গোয়ালা এবং সুনীত হলো জাতিতে পুক্কুস। রাজা বিম্বিসার নিজ পুত্র অজাতশত্রুর রাজ্যলিপ্সার কথা বুঝতে পেরে তার হাতে শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নগরী থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগবশত রাজা বিম্বিসার এই ধর্মের প্রচারে বিশেষ ভূমিকাও পালন করেছিলেন। কিন্তু রানী লোকেশ্বরী এবং রাজকন্যারা রাজনটী শ্রীমতীকে কোনোভাবেই অন্তরে গ্রহণ করতে পারেননি। উদ্ধত রাজা অজাতশত্রু ঘোষণা করেছে — 'সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে।' (রবীন্দ্রনাথ (৯), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ২৪০)। শাস্ত্রাচার-প্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপরীতে নববিকশিত বৌদ্ধধর্মের অগ্রযাত্রায় সন্ত্রস্ত অভিমানাহত রাজমহিষী এবং রাজকন্যারা আভিজাত্যের দম্ভে অস্বীকার করেছে ব্রাত্য শ্রীমতীকে। রাজা বিম্বিসারের আদেশ মতো অশোকচৈত্যে বুদ্ধ-পূজার সময়ে রক্ষিণীর অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারায় শ্রীমতী। ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের উদ্ধত হিংসার কাছে নির্মমভাবে প্রাণপাত করে শ্রীমতী। শ্রীমতীর এই নির্দয় পরাভব কেবল রাজন্যের ক্রোধের কাছে এক অসহায়া নারীর আত্মসমর্পণ নয়, ব্রাত্য ও অনভিজাত নারী হিসেবে শ্রীমতীর প্রতি ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার এক হৃদয়হীন আলেখ্য হিসেবে *নটীর পূজা* রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাটকের বৈচিত্র্যময় জগতে মানুষের ভিন্নমাত্রিক পরিচয়ের সীমানা বর্ণিত হলেও রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনার অন্তর্নিহিত স্বরূপ কোথাও বিঘ্নিত হয়নি। *অচলায়তন* নাটকের অভিজাত পরিবেশ ও অভিজাত মানুষের মন্ত্রসিদ্ধ আবহের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন অবজ্ঞাত মানুষের জ্যোতির্ময় প্রাণশক্তি। মন্ত্রপূত অচলায়তনের বন্দি বৃত্তে পঞ্চক, মহাপঞ্চক, আচার্য, উপাধ্যায় সমবেতভাবে নির্মাণ করেছেন অবরুদ্ধ এক জগৎ, যেখানে প্রবেশ পায় না অবারিত প্রকৃতির আলো, সেখানে অনুভব করা যায় না উন্মুক্ত জগতের বিশালতা ও ঔদার্য। মানুষের মধ্যে মানবত্বের যে অন্তর্গত ব্যঞ্জনা যা অন্তরে গ্রহণ করে অপরাপর ব্যক্তিকে, মুহূর্তেই যা একাত্ম করে নেয় দূরবর্তী জনকে সেই বৃহত্তর মানবত্বের ইশারা *অচলায়তন* নাটকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই ইশারা মুক্তির এবং এই ইশারা বন্ধনমোচনের। দর্ভকপল্লির দর্ভকশ্রেণি কিংবা শোনপাংশু দলের কোনো অভিজাত গোত্র-পরিচয় বা কৌলিন্য নেই, ব্রাত্যের মলিন ক্লিন্নতা নিয়ে তারা বাস করে দূরবর্তী লোকালয়ে। আচার্য অদীনপুণ্য যাতে শত্রুপক্ষে যোগ দিতে না পারে সেজন্য তাকে দর্ভকদের পাড়ায় বন্দি করে রাখার সিদ্ধান্ত হলে জয়োত্তম বলেছে — 'আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায় ! তারা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি।' (রবীন্দ্রনাথ (৬), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩৩৫)

তিনশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে যে অচলায়তনের জানালা খোলা হয়নি সেই নীরন্ধ্ররূঢ়

নিকেতনের আচার্য শোনপাংশুদের বলেছে ম্লেচ্ছ এবং তাদের সহবাস ত্যাজ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অচলায়তনের গুরুকে দেখার বাসনা করায় এক শোনপাংশুকে উদ্দেশ্য করে পঞ্চক বলেছে :

> তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ। তিনি তো শোনপাংশুদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেয়। তোদেরও তো গুরু আছে — তাকে নিয়েই — (রবীন্দ্রনাথ (৬), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩১৯)

আভিজাত্যের দম্ভে কোনো গুরু মন্ত্র দেয় না, এ-কারণেই জন্যই চণ্ডক দর্ভকপল্লি ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অথচ এই শোনপাংশুরাই মাঠে অজস্র ফসল ফলায়, চাষ করে আনন্দে এবং সবুজ প্রাণের উল্লাসে পূর্ণ করে সুদূর দিগন্ত। মাঠে কাঁকুড়ের চাষ করে বলে নিন্দিত হয় শোনপাংশুরা। ভদ্র-সভ্যদের বাজারে তাদের শ্রমের ফসল যায় অথচ পঞ্চক বলেছে — 'কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।' (রবীন্দ্রনাথ (৬), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩১৯)

কিন্তু অচলায়তনের রুদ্ধ প্রাচীর ভেঙে চিরমুক্তির বাণী নিয়ে আসে দাদাঠাকুর এবং অন্ত্যজ পতিত শোনপাংশুদের দল। মুক্ত প্রাণের ব্যাকুলতা আর অবারিত আলোর উদ্ভাসে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে অচলায়তনের স্থবিরতা। দর্ভকপল্লির অন্ত্যজ সাধারণের কাছে যিনি ছিলেন প্রাত্যহিক অন্তরঙ্গ মানুষ, অচলায়তনের সংকীর্ণ অভিজাতদের কাছে সেই দাদাঠাকুরই হয়ে ওঠেন মহামুক্তির মান্য জন। *অচলায়তন* নাটকে রবীন্দ্রনাথ মানবীয় সর্বজনীনতার বৃহত্তর ঐক্য নির্মাণ করেছেন এবং এই প্রয়াস কবির মানবোপলব্ধির চিরায়ত দ্যোতক। দাদাঠাকুর পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার নবনির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন — 'ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোনপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।' (রবীন্দ্রনাথ (৬), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩৫১)

দাদাঠাকুর ও তার অনুবর্তী শোনপাংশুদের হাতে অচলায়তনের মুক্তি সূচিত হয় এবং সেখানে দেখা দেয় অমৃত জীবনের অনন্য উল্লাস। দাদাঠাকুর পঞ্চককে ব্যঙ্গ করে বলেছেন — 'ভয় নেই পঞ্চক। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি।' (রবীন্দ্রনাথ (৬), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩৪৯)

সেই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়েই তৈরি হবে অচলায়তনের শুভ্র বিনির্মাণ এবং এ নাটকে রবীন্দ্রনাথের মানবদৃষ্টি সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোনপাংশুদের রক্ত মিলে গড়ে উঠবে মানুষের নতুন পরিচয় এবং সেই মানুষ বিভক্ত নয়, দীর্ণ নয়, কুণ্ঠিত নয়। সমবেত সত্তার যৌথ আবাহনে মানুষ পরিণত হবে মানবে এবং মানবীয় ঔজ্জ্বল্যের পথ ধরেই নিশ্চিত হবে সংস্কারহীন মুক্ত প্রাণের অভিষেক। স্থবিরক এবং শোনপাংশুদের রক্তের উত্তরাধিকারে আলোকিত ভুবন প্রতিষ্ঠার মানবিক আহ্বানে এ নাটকের সমাপ্তি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনার মৌল অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে *অচলায়তনের* প্রান্তিক বর্ণনায় :

সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে। (রবীন্দ্রনাথ (৬), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৩৫২)

রবীন্দ্রনাথের মানবকেন্দ্রিক ধারণা পরিশেষে বিশ্বজনীন মানবতাবোধে উত্তীর্ণ হয়। রীতিবন্ধনের বাইরে তিনি অন্বেষণ করেছেন রক্তমাংসের মানুষকে, সীমার গণ্ডির মধ্যে তাকে তিনি হারিয়েছেন, কিন্তু সেই মানুষকেই আবার তিনি বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজে পেয়েছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মঙ্গলময় আদর্শিক মানবধারণা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে গেছেন। ইতিহাসের মহাযুগে আলো, অস্ত্র আর মহাবাণী নিয়ে যারা আবির্ভূত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাদের বলেছেন সগোত্র, সবর্ণ। ক্ষণকালীন নয়, চিরকালের মানুষকে পেতে চেয়েছেন তিনি। সেই চিরকালের মানুষ হলেন তিনিই যিনি ভেদচিহ্নের ব্যবধান ঘুচিয়ে সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে নিপীড়িত মানুষকে তুলে নিয়ে আসবেন। বিধিবিধানের দৃঢ় বন্ধনে জর্জরিত মানুষের পঙ্‌ক্তিতে কবি আশ্রয় পেতে চাননি এবং সে-কারণে তিনি ঠাঁই নিতে চেয়েছেন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখে আলোড়িত লোকালয়ে। কবির অন্তর্গত আকুতি ছিল ধূলিমলিন সাধারণ মানুষের প্রতি এবং শুচিময় অভিজাত জনের প্রতি ব্যক্ত হয়েছে তাঁর দূরাগত বিতৃষ্ণা :

বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি,
তাই আমার বন্ধুহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়,
ওরা তার ওপাশ দিয়ে চলে গেছে
বসনপ্রান্ত তুলে ধরে।
ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল—
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে
সকল দেশের সকল ফুল—
এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।
(রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ১২৮)

'এক সূর্যের আলোর' মতোই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীনতার অফুরন্ত আলোয় উদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছেন সাধারণ বিশ্বমানবকে। যে মানুষ অনাবৃত, যার চারদিকে নেই বাঁধাবাঁধির কোনো প্রাচীর সেই বৃহৎ মানবের অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণে উৎসুক রবীন্দ্রনাথ। সত্যের জন্য প্রাণপাতে নির্ভীক মানুষকে এ কারণে তিনি বলেছেন অমৃতের সন্তান। উনিশ ও বিশ শতকের বিশ্ববাস্তবতার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সত্যের কঠিন মূল্যে মানবজীবনকে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। দেবলোক কিংবা পৌরাণিক মহিমার অত্যুচ্চ জগৎ থেকে মানুষের সন্ধানে তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে রুক্ষ কঠিন মাটির কাছাকাছি। ধর্ম-শাস্ত্র-বর্ণ-গোত্র-বিধি-বিধানকে তুল্যমূল্যজ্ঞানে বিচার করে অতি সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ একাত্ম হয়ে যেতে চেয়েছেন বাস্তবের মানুষের সঙ্গে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি মোহমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে ইউরোপের নগ্ন বর্বরতার বিরুদ্ধে ব্যক্ত করেছেন তাঁর তীব্র ঘৃণা, আবার একই সঙ্গে মানুষের বৃহত্তর সত্তা ও মহিমার প্রতি আস্থা রেখে উচ্চারণ করেছেন, 'কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস

হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।' (*রবীন্দ্রনাথ* (১৩), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৭৪৪)। ভৌগোলিক পরিচয়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, বিশ্বজনীন মানবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন — 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।' (*রবীন্দ্রনাথ* (১৩), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ৭৪৪)। এই বিশ্বাসেরই সম্প্রসারণ লক্ষ করি *পত্রপুটের* নিচের পঙক্তিগুলোতে —

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।
(রবীন্দ্রনাথ (১০), ১৩৯৩-১৩৯৮ : ১৩১)

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দেবনির্ভরতা এবং অধ্যাত্মবিশ্বাসের সনাতন কাঠামো ভেঙে, মঙ্গলময় মনুষ্যত্বের ধারণাকে বিচূর্ণ করে দেহধারী মানুষকে প্রধান করে দেখেছেন। তথাকথিত অভিজাত সম্ভ্রান্ত মানবের সন্ধানে ব্যাপৃত না থেকে তিনি অন্বেষণ করেছেন চারপাশের মানুষকে, ইতিহাসের ধূসরলোক থেকে বর্তমানের উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-শোণিতলিপ্ত প্রাকৃত মানুষের আবাহনে রবীন্দ্রনাথ নিরত থেকেছেন। এই মানুষই তাঁর প্রণম্য, এই মানুষই তাঁর শেষ আশ্রয়।

টীকা

১. সংক্ষেপে 'র.র', লিখে বোঝানো হয়েছে *রবীন্দ্র রচনাবলী*। ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ হিসেবে ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত এই রচনাবলী থেকেই এ প্রবন্ধে রবীন্দ্র-রচনার সকল উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৯৩ সালে এবং পঞ্চদশ খণ্ড বের হয় ১৩৯৮ সালে।

গ্রন্থপঞ্জি

অতুল সুর, ১৯৮৮। *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

আবুল হাসনাত (সম্প.), ১৯৮৭। *নানা রবীন্দ্রনাথের মালা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সন্তোষ গুপ্ত রচিত 'রবীন্দ্র ভাবনা : জাতীয়তা ও প্রগতি' দ্রষ্টব্য।

নেপাল মজুমদার, ১৯৯১। *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, ৩য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ (সম্পা.), ১৯৯৪। *রবীন্দ্রনাথ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। আহমদ রফিক রচিত 'রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন চিন্তা', দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯৩-১৩৯৮। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১৫ খণ্ডের সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯২। সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৩৮৮। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।